অধ্যায় - ৪

শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন, সন্তদের অবতার কার্য্য, পবিত্র তীর্থ শিরডী, শ্রী সাইবাবার ব্যক্তিত্ব, গৌলী বুয়ার অভিজ্ঞতা, শ্রী বিট্ঠল-এর আবির্ভাব, ক্ষীরসাগরের কথা, দাসগণুর প্রয়াগ স্নান, তিনটি 'ওয়াড়া'।

সন্তদের অবতার ক্রীড়া (লীলা)

ভগবদ্গীতায় (চতুর্থ অধ্যায় ৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "যে-যে কালে ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, সে-সে সময় আমি অবতার ধারণ করি। ধর্মস্থাপন, দুষ্টজনের বিনাশ এবং সাধুজনদের পরিত্রাণের জন্য আমি যুগে-যুগে জন্ম নিই।" সাধু-সন্ত ভগবানেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। তাঁরা উপযুক্ত সময়ে আবির্ভূত হয়ে নিজেদের অবতার কার্য্য পূর্ণ করেন। অর্থাৎ যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিজেদের কর্তব্যের প্রতি বিমুখ হয়ে যায়; যখন শুদ্র উচ্চ জাতির লোকেদের অধিকার কাড়তে শুরু করে; যখন ধর্মের আচার্য্যদের অনাদর ও নিন্দা হয়; যখন লোকজন নিষিদ্ধ ভোজ্য পদার্থ ও মদ্যপান করতে শুরু করে ও ধর্মের আড়ালে নিন্দিত কার্য্য স্থান পায়; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন পরস্পর দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে; যখন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাদি কর্ম ছেড়ে দেয়, কর্মঠ পুরুষদের ধার্মিক কার্য্যে অরুচি উৎপন্ন হয়ে যায়; যখন যোগীগণ ধ্যানাদি কর্ম করা ছেড়ে দেন এবং যখন জনসাধারণের এই ধারণা হয়ে যায় যে, শুধু **ধন, সন্তান এবং স্ত্রীই সর্বস্ব এবং এইভাবে লোকেরা সত্যের পথ হতে বিচলিত হয়ে অধঃপতনের দিকে** অগ্রসর হতে শুরু **করেঃ- তখন সন্তগণ আবির্ভূত হয়ে নিজেদের উপদেশ এবং আচরণ দ্বারা ধর্মের সংস্থাপনা করেন।** তাঁরা সমুদ্রে আলোকস্তম্ভের ন্যায় আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং সত্যের পথে চলতে প্রেরণা দেন। এই ভাবে বহু মহামানব যেমন- নিবৃত্তিনাথ, তুকারাম, নরহরি, নরসীভাই, সঞ্জন কসাই, রামদাস এবং অন্যান্য অনেকে সত্যের পথের দিগ্দর্শন করাবার জন্য বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সর্বশেষে শিরডীতে শ্রী সাইবাবার অবতার লীলা ঘটে।

পবিত্র তীর্থ শিরডী

আহমদনগর জেলার গোদাবরীর তীর খুবই ভাগ্যবতী। এখানে অনেক সন্তরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অনেকে আশ্রয় পেয়েছেন। এই ধরনের সন্তদের তালিকায়

শ্রী জ্ঞানেশ্বর মহারাজ প্রধান। শিরডী আহমদনগর জেলার কোপরগ্রাম তালুকে পড়ে। গোদাবরী নদী পার করে রাস্তা সোজা শিরডী যায়। আট মাইল চলার পর নিমগ্রাম পৌঁছতেই শিরডী দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণা নদীর তীরে অন্যান্য তীর্থস্থান যেমন- গঙ্গাপুর, নরসিংহবাড়ী এবং ঔদুম্বরের ন্যায় শিরডীও এক প্রসিদ্ধ তীর্থ। যেমন দামোজী মঙ্গলবেড়াকে, রামদাস সজ্জনগরকে, দত্তাবতার নরসিংহ সরস্বতী বাড়ীকে পবিত্র করেছিলেন, ঠিক সেই রকমই শ্রী সাইনাথ শিরডীতে অবতীর্ণ হয়ে এই স্থানটিকে ধন্য করেন। শ্রী সাইবাবার সান্নিধ্যে শিরডীর মাহাত্ম্য বিশেষ বেড়ে যায়। এবার আমরা তাঁর চরিত্রের দিকে আসব। তিনি এই ভবসাগর জয় করে নিয়েছিলেন, যেটি পার করা অত্যন্ত দুষ্কর ও কঠিন। শান্তি তাঁর আভূষণ ছিল এবং তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। বৈষ্ণব ভক্তরা সর্বদাই তাঁর চরণে আশ্রয় পেতো। দানবীরদের মধ্যে রাজা কর্ণের মত দানী ছিলেন। ঐহিক পদার্থর প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ অরুচি বোধ হত। সর্বক্ষণ আত্মস্বরূপেই নিমগ্ন থাকা তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। অনিত্য বস্তুর আকর্ষণ তাঁকে ছুঁতে পারত না। তাঁর মন দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ছিল। তাঁর শ্রীমুখ থেকে সর্বদাই অমৃত ঝরত। তিনি কখনো গরীব ও ধনীর মধ্যে পার্থক্য করেননি। মান-অপমানের বিষয়েও কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তা করতেন না- নির্ভয় হয়ে সম্ভাষণ করতেন। বিভিন্ন প্রকারের লোকেদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন, নর্তকীদের অভিনয় এবং নৃত্য দেখতেন ও 'গজল'-কাওয়ালীও শুনতেন। এসবের মাঝেও তাঁর সমাধি (ধ্যান) কিঞ্চিৎমাত্রও ভঙ্গ হত না। 'আল্লা'-র নাম সব সময় ওঁর জিভে ঘুরে বেড়াত। জগৎ ঘুমোলে তিনি জাগতেন এবং জগৎ জাগলে তিনি ঘুমোতেন। এর ব্যাখ্যা যদি ভগবদগীতার হিসেবে নেওয়া হয় তাহলে এইরূপ বলা যায় - যে বিষয়ে জগতের লোক লালয়িত বা সজাগ থাকে সে সব বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন এবং যে শাশ্বত ও নিত্য বস্তুর দিকে জগত সুপ্ত থাকে সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতেন। (সুখিয়া সব সংসার হ্যায়, খায়ে অরু শোয়ে। দুখিয়া দাস কবির হ্যায় জাগে অরু রোয়ে- কবীর)। তাঁর অন্তঃকরণ প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় শান্ত ছিল। কেউ নাতো তাঁর বর্ণাশ্রম জানতে পেরেছে আর না পেয়েছে তাঁর কার্য্যপ্রণালীর হদিস। একই স্থানে বাস করেও বিশ্বের সমস্ত ঘটনার খবর তাঁর মুঠোয় থাকত। তাঁর দরবার অতি চিত্তাকর্ষক ছিল। তিনি অনেক রকমেরই গল্প-গুজব করতেন, কিন্তু তাঁর অখন্ড শান্তি কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হত না। তিনি প্রতিদিন মস্‌জিদের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতেন। সকালে, দুপুরে ও বিকেলে নিয়মিতভাবে 'চাওড়ী'তে বেড়াতে যেতেন। সেই সময়ও সর্বক্ষণ আত্মস্থিত থাকতেন। তিনি বিনম্র, দয়ালু ও অভিমান-শূণ্য ছিলেন। সদাই সবাইকে সুখ দিয়েছেন। এইরূপ

ছিলেন আমাদের শ্রী সাই বাবা যাঁর চরণস্পর্শ পেয়ে শিরডী পবিত্র হয়ে গেছে। তার মাহাত্ম্য অসাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে জ্ঞানেশ্বর আলন্দীকে এবং একনাথ পৈঠনের উত্থান করে্ছিলেন, ঠিক সেইভাবে শ্রী সাইবাবা শিরডীকে উদ্দীপ্ত করেন। শিরডীর ফুল, পাতা ও পাথরও ধন্য, যারা শ্রী সাই চরণের চুম্বন পেয়েছে এবং তাঁর চরণের ধূলি মাথায় ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। ভক্তদের জন্য শিরডী একটি দ্বিতীয় পন্ঢরপুরী, জগন্নাথপুরী,দ্বারকা, বেনারস (কাশী), মহাকালেশ্বর এবং মহাবলেশ্বর হয়ে গড়ে উঠল। শ্রী সাইয়ের দর্শন করাই ভক্তদের জন্য বেদমন্ত্র ছিল, যার পরিণামস্বরূপ আসক্তি কমতে থাকত এবং আত্মদশর্নের পথ সহজতম হয়ে যেত। তাঁর পাদসেবন করাই ত্রিবেণী (প্রয়াগ) স্নানের সমান এবং চরণামৃত পান করলেই সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হওয়ার ন্যায় তৃপ্তি প্রাপ্ত হত। তাঁর আদেশ আমাদের জন্য বেদবাক্য। প্রসাদ এবং উদী (বিভূতি) গ্রহণ করলে মন শুদ্ধ হত। তিনি আমাদের রাম, কৃষ্ণ ও পরমব্রহ্ম, যিনি আমাদের মুক্তি প্রদান করলেন। তিনি কখনো নিরাশ বা হতাশ হতেন না। তিনি ছিলেন আনন্দের মঙ্গলমূর্তি। নামমাত্রেই শিরডী তাঁর প্রধান কেন্দ্র ছিল কিন্তু তাঁর কার্য্যক্ষেত্র পাঞ্জাব, কলিকাতা, উত্তর ভারত, গুজরাত, ঢাকা এবং কোংকণ অবধি বিস্তৃত ছিল। শ্রী সাইবাবার খ্যাতি দিন-প্রতিদিন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তরা দর্শন লাভের জন্য শিরডীতে আসতে শুরু করল। কেবলমাত্র দর্শনেই লোকেদের হৃদয় শান্ত হয়ে যেত। তারা ঠিক সেই রকমই আনন্দ অনুভব করত, যেমন পন্ঢরপুরের শ্রী বিট্ঠলের দর্শন করলে আনন্দ হয়। এটা কোন অতিরঞ্জিত উক্তি নয় - দেখুন একজনের এমনই অনুভূতি হয়।

গৌলী বুওয়া

প্রায় ৯৫ বছরের বয়োবৃদ্ধ ভক্ত, যাঁর নাম গৌলী বুওয়া ছিল, পন্ঢরীর এক পর্য্যটক ছিলেন। উনি ৮ মাস পন্ঢরপুরে এবং চার মাস (আষাঢ় থেকে কার্ত্তিক মাস অবধি) গঙ্গাতীরে বাস করতেন। জিনিষপত্র বইবার জন্য একটা গাধা নিজের কাছে রাখতেন এবং একজন শিষ্যও সব সময় ওঁর সঙ্গে থাকত। উনি প্রতি বছর পন্ঢরপুর যেতেন এবং ফেররার পথে শ্রী বাবার দর্শন করার জন্য শিরডী আসতেন। বাবার প্রতি ওঁর অগাধ প্রেম ছিল। উনি নির্ণিমেষ নয়নে বাবার দিকে চেয়ে থাকতেন এবং বলে উঠতেন- 'এই তো শ্রী পন্ঢরীনাথ, শ্রী বিট্ঠলের অবতার, যিনি দীনের উপর কৃপা করেন ও অনাথের নাথ।' গৌলী বুয়া শ্রী বিট্ঠলের পরম ভক্ত ছিলেন। উনি অনেকবার পন্ঢরীপুরের যাত্রা করেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন যে, শ্রী সাইবাবা সত্যি-

সত্যিই পন্ঢরীনাথ।

বিট্‌ঠল স্বয়ং আবির্ভূত হন

শ্রী সাইবাবার ঈশ্বর চিন্তন এবং ভজন-কীর্তনে বিশেষ অভিরুচি ছিল। তিনি সব সময় 'আল্লাহ মালিক' উচ্চারণ করতেন এবং ভক্তদের দিয়ে কীর্তন সপ্তাহের আয়োজন করাতেন। এটিকে 'নামসপ্তাহ'ও বলা যেতে পারে। একবার উনি দাসগণুকে নামসপ্তাহ (কীর্তণ সপ্তাহ) করবার আদেশ দেন। তাতে দাসগণু বলেন- "আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করছি, কিন্তু একটা আশ্বাস পেতে চাই যে, সপ্তাহের শেষে বিট্‌ঠল অবশ্যই দেখা দেবেন।' বাবা নিজের বুক স্পর্শ করে বললেন- "বিট্‌ঠল অবশ্যই দেখা দেবেন। কিন্তু তার জন্য ভক্তদের মধ্য শ্রদ্ধা ও তীব্র উৎকণ্ঠাও অনিবার্য্য। ঠাকুর নাথের ডঙ্কপুরী, বিট্‌ঠলের পন্ঢরী, রণছোড়ের দ্বারকা ত এখানেই। কারো অত দূরে যাওয়ার দরকার নেই। বিট্‌ঠল কি বাইরে কোথাও থেকে আসবেন? তিনি এখানেই বিরাজমান। যখন **ভক্তদের মধ্যে প্রেম এবং ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হবে, তখন বিট্‌ঠল স্বয়ং এখানে আবির্ভূত হবেন।"**

সপ্তাহ শেষ হওয়ার পর বিট্‌ঠল ভর্গবান সত্যি-সত্যি দেখা দেন। কাকাসাহেব দীক্ষিত নিত্য নিয়মানুসারে স্নান করার পর যখন ধ্যান করতে বসেন, তখন বিট্‌ঠলের দর্শন পান। দুপুরে যখন বাবার দর্শনার্থে মস্‌জিদে পৌঁছন, তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "কি হে? বিট্‌ঠল পাটীল এসেছিলেন না? তুমি তাঁর দর্শন করলে? উনি খুব চঞ্চল। তাই কষে ধরে রেখো। যদি একটুও অসাবধান হও, তাহলে কিন্তু উনি পালিয়ে যাবেন।" এই ঘটনাটি ভোরবেলায় ঘটে এবং দুপুরবেলা কাকাসাহেব আবার দর্শন পান। ঠিক ঐ দিন এক ছবি বিক্রেতা ২৫-৩০টা বিঠোবার ছবি নিয়ে সেখানে বিক্রী করতে আসে। এই ছবিটি ঠিক ঐ রকমটি ছিল যেমনটি কাকাসাহেব ধ্যানে দেখেছিলেন। ছবিটি দেখে ও বাবার কথা স্মরণ করে কাকাসাহেব খুবই বিস্মিত ও প্রসন্ন হন। উনি একটা ছবি সানন্দে কিনে নিজের পূজোর ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ঠানার অবসরপ্রাপ্ত মামলতদার শ্রী বি. ভি. দেব নিজের অনুসন্ধান দ্বারা এটা প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে, শিরডী পন্ঢরপুরের পরিধির মধ্যেই পড়ে। দক্ষিণে পন্ঢরপুর শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ বাসস্থান, অতএব শিরডী দ্বারকাপুরী (সাই লীলা পত্রিকা ভাগ ২, পৃষ্ঠা ১১০ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

চতুর্ণামপি বর্গণাং যত্র দ্বারাণি সর্বতঃ।
অতো দ্বারাবতীমুক্তা বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।।

যেই স্থান চারি বর্গের লোকেদের জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের জন্য সুলভ, দার্শনিকজন সেই জায়গাকে দ্বারকা' নামে ডাকেন। শিরডীতে বাবার মস্‌জিদ শুধুমাত্র চারি বর্ণের লোকেদের জন্যই নয়, বরং দলিত, অস্পৃশ্য ও ভাগোজী সিন্দের মত কুষ্ঠদের জন্যও খোলা ছিল। সুতরাং শিরডীকে দ্বারকা বলাই উচিত।

ভগবন্তরাও ক্ষীরসাগরের কথা

শ্রী বিট্‌ঠল পূজো বাবার কত ভালো লাগত, সেটা ভগবন্তরাও ক্ষীরসাগরের কাহিনীর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভগবন্তরাও-য়ের বাবা বিঠোবার পরমভক্ত ছিলেন। উনি প্রতি বছর পন্ঢরপুরে জল নিয়ে যেতেন। ওঁর বাড়ীতে বিঠোবার একটা মূর্তিও ছিল এবং উনি তাঁর নিয়মিত পূজো করতেন। ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর ছেলে ভগবন্তরাও তীর্থযাত্রা, পূজো, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত বন্ধ করে দেন। যখন ভগবন্তরাও শিরডী আসেন তখন বাবা ওঁকে দেখেই বলে উঠেন- "এঁর পিতৃদেব আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তাই আমি এঁকে এখানে ডেকেছি। ইনি কখনোই নৈবেদ্য অর্পণ করেননি এবং আমাকে ও বিঠোবাবাকে না খাইয়ে মারছেন। তাই আমি এঁকে এখানে আসার প্রেরণা দিই। এবার আমি জেদ করে এঁকে দিয়ে পুজো-অর্চনা শুরু করাব।"

দাসগণুর প্রয়াগ স্নান

গঙ্গ-যমুনার সঙ্গমে প্রয়াগ এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। হিন্দুদের এমন ধারণা যে, সেখানে স্নানাদি করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক উৎসব বা পর্বে ভক্তগণ সেখানে যান এবং স্নান করে পূণ্য লাভ করেন। একবার দাসগণুরও সেখানে গিয়ে স্নান করার ইচ্ছে জাগে। তাই উনি বাবার কাছে অনুমতি নিতে উপস্থিত হন। বাবা বললেন- **'মিছিমিছি অত দূর যাওয়ার কি দরকার? আমাদের প্রয়াগ তো এখানেই।** আমার উপর বিশ্বাস রাখো।" আশ্চর্য্য! মহান আশ্চর্য্য! যেই দাসগণু বাবার চরণে নতমস্তক হন অমনি বাবার শ্রী চরণ হতে গঙ্গা-যমুনার ধারা বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে দাসগণু প্রেমভাবে বিভোর হয়ে উঠলেন। চোখ থেকে প্রেমাশ্রু অঝোরে বইতে লাগল। ওঁর মুখ থেকে শ্রী সাই বাবার স্রোতস্বিনী স্বতঃপ্রবাহিত হতে লাগল।

শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন

শ্রী সাইবাবার মাতা, পিতা বা জন্মস্থানের বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। এই বিষয়ে অনেক খোঁজ-খবর করা হয়েছে। বাবাকে ও অন্যালোকেদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক উত্তর বা সূত্র পাওয়া যায়নি। আসলে আমরা এই ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ। নামদেব এবং কবীর দাসের জন্ম অন্যান্য লোকদের ন্যায় হয়নি। নামদেবকে গোণাই ভীমরথী নদীর তীরে ও কবীর দাসকে তমাল ভাগীরথী নদীর তীরে দেখতে পেয়েছিলেন। ঠিক এরকমই শ্রী সাইবাবার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। তিনি শিরডীর এক নিম বৃক্ষের নীচে ষোল বছরের তরুণ বালকের রূপে ভক্তদের কল্যাণার্থে দেখা দেন। সেই সময়ও তাঁকে দেখে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী মনে হত। স্বপ্নেও তিনি কোন লৌকিক পদার্থের ইচ্ছা করতেন না। তিনি মায়াকে দূরে রাখতেন এবং মুক্তি তাঁর চরণে স্থান খুঁজত। শিরডী গ্রামের এক বৃদ্ধা (নানা চোপদাদের মা) তাঁকে এইরূপ বর্ণনা করেছেন - "একটি তরুণ, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ এবং অতি রূপবান বালক নিম বৃক্ষের নীচে সমাধিতে লীন দেখা যায়। গ্রীষ্ম বা শীতের চিন্তা তার কিঞ্চিৎমাত্র ছিল না। তাঁকে এত অল্প বয়সে এত কঠিন তপস্যা করতে দেখে লোকেরা খুব অবাক হত। দিনের বেলা তিনি কারো সাথে দেখা করতেন না এবং রাত্তিরে নির্ভয়ে একান্তে ঘুরে বেড়াতেন। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করত যে, তরুণটি কোথা থেকে এসেছে। তাঁকে দেখতে এত সুন্দর ছিল যে, একবার দেখলেই মানুষ তাঁর দিকে আকর্ষিত হয়ে যেত। তিনি সর্বক্ষণ নিম বৃক্ষের নীচে বসে থাকতেন এবং কারো বাড়ী যেতেন না। যদিও বয়সে তরুণ ছিলেন, তবুও তাঁর ব্যবহার মহাত্মাদের মত ছিল। তিনি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন।" একবার একটি খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। এক ভক্তের উপর ভগবান খন্ডোবা ভর করেন। সন্দেহ দূর করার জন্য লোকে বাবার বিষয়ে প্রশ্ন করে- "হে দেব! দয়া করে বলুন ইনি কোন ভাগ্যবান পিতার পুত্র এবং ইনি কোথা থেকে এসেছেন।" তখন ভগবান খণ্ডোবা একটা কোদাল আনতে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থান খুঁড়তে বললেন। সেই স্থানটি বেশ খানিকটা খোঁড়া হলে একটা পাথরের নীচে একটা ইঁট পাওয়া যায়। ইঁটটা সরাতেই সেখানে একটা দরজা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে চারটি প্রদীপ জ্বলছিল। ঐ দরজা থেকে একটি পথ একটি গুহার দিকে যাচ্ছিল যেখানে গোমুখী আকারের একটি ইমারত, একটা কাঠের তক্তা, মালা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান খন্ডোবা বললেন- "এই যুবকটি এখানে বারো বছর তপস্যা করেছে।" এরপর লোকেরা দরজাটাকে আবার বন্ধ করে দেয়। যেরকম অশ্বত্থ গাছকে আমরা পবিত্র মনে করি, ঠিক সেই রূপই

বাবা এই নিম বৃক্ষটিকে পবিত্র মনে করতেন ও খুবই ভালবাসতেন। মহালসাপতি এবং শিরডীর অন্যান্য ভক্তরা এই স্থানটিকে বাবার গুরুর সমাধিস্থল মনে করে সদা সশ্রদ্ধায় প্রণাম করতেন।

তিনটি 'ওয়াড়া'

নিম বৃক্ষের চারিপাশের জমিটি শ্রী হরি বিনায়ক সাঠে কিনে নিয়েছিলেন এবং সেখানে একটা বিশাল ভবন নির্মাণ করান, যার নাম 'সাঠে ওয়াড়া' রাখা হয়। বাইরের লোকেদের জন্য এই ভবনটিই একমাত্র বিশ্রাম গৃহ ছিল এবং সেখানে সর্বক্ষণই ভিড় থাকত। নিম গাছের দক্ষিণ দিকে একটা ছোট্ট মন্দির আছে, যেখানে ভক্তরা দালানের উপর উত্তরাভিমুখী হয়ে বসে। লোকেদের এমন বিশ্বাস যে, যে যারা বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারে সন্ধ্যার সময় সেখানে ধূপ ইত্যাদি সুগন্ধিত পদার্থ জ্বালায় তারা ঈশ্বরের কৃপায় সর্বদা সুখী থাকবে। এই ভবনটি খুবই পুরনো ও জরা-জীর্ণ অবস্থায় ছিল। তার জীর্ণতা সংস্কার করাবার নিতান্তই দরকার বোধ হচ্ছিল। এই কাজটি সংস্থান দ্বারা করা হয়। কিছুদিন পর আরেকটি ভবন তৈরী করা হয় এবং এর নাম দীক্ষিত ওয়াড়া রাখা হয়। কাকাসাহেব দীক্ষিত ইংল্যান্ডে থাকাকালীন এক দুর্ঘটনার ফলে পায়ে গুরুতর আঘাত পান। উনি অনেক রকমের চিকিৎসা করান, কিন্তু সেই অসুস্থতার থেকে আরোগ্যলাভ হচ্ছিল না। নানাসাহেব চাঁদোরকর তাঁকে বাবার কৃপা প্রাপ্ত করবার পরামর্শ দেন। তাই কাকাসাহেব দীক্ষিত স্থায়ীভাবে শিরডীতে থাকবেন বলে স্থির করেন এবং ভক্তদের থাকার জন্য একটা ভবন নির্মাণ করান। এই ভবনের শিলান্যাস ৯-১২-১৯৯০ সালে হয়। ঐ দিনই দুটি বিশেষ ঘটনা ঘটে - ১) শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি পান। ২) চাওড়ীতে রাত্তিরের আরতি আরম্ভ হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ভবন পুরোপুরি তৈরী হয়ে যায় এবং রামনবমীর (১৯১১) শুভ দিনে এর উদ্‌ঘাটন করা হয়। এর পর, নাগপুরের এক লক্ষপতি শ্রী বুটী সাহেব আরেকটি ভবন নির্মাণ করান। এই ভবন নির্মাণের জন্য অনেক ধনরাশি ব্যয় হয়। কিন্তু ওঁর সমস্ত পরিশ্রম ও ধন সার্থক হয়েছিল কারণ বাবার পবিত্র শরীর এখন ওখানেই শায়িত রয়েছে। বুটী 'ওয়াড়া'ই বর্ত্তমানে 'সমাধি-মন্দির' নামে বিখ্যাত। এই মন্দিরের জায়গায় এক সময় একটা বাগান ছিল, যেখানে বাবা স্বয়ং গাছে জল দিতেন এবং দেখাশুনা করতেন। যেখানে এক সময় একটা ছোট্ট কুটীরও ছিল না, সেখানে তিন-তিনটে ভবন নির্মাণ হয়ে গেল। এদের মধ্যে 'সাঠে ওয়াড়া' পূর্বকালে খুবই উপযোগী ছিল। বাগানের কথা, বামন তাত্য়ার সাহায্যে স্বয়ং বাগানের দেখাশোনা, শিরডী থেকে শ্রী সাইবাবার

অস্থায়ী অনুপস্থিতি এবং চাঁদ পাটীলের বরযাত্রীর সাথে আবার শিরডী ফেরা, দেবীদাস, জানকী দাস এবং গঙ্গাগীরের সঙ্গতি, মোহিদ্দীন তম্বোলীর সাথে কুস্তি, মস্‌জিদে তাঁর অবস্থান, শ্রী ডেঙ্গলে এবং অন্যান্য ভক্তদের প্রতি প্রেম এবং অন্যান্য ঘটনাগুলির বর্ণনা পরের অধ্যায়ে করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্‌ ভবতু ।।